আধুনিক বাংলা কবিতায় উপমা, রূপকল্প ও চিত্রকল্প

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, "আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।" ('আধুনিক কাব্য', বৈশাখ ১৩৩৯) 'মর্জি' অর্থাৎ মনোভাবই হল আসল কথা। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকের মন পালটায়, সমাজ পালটায়, কাব্যের বিষয় পালটায়, অনিবার্যভাবে তার ভাষাও পালটায়। এই 'বাঁক নেওয়া' সময়টিই আধুনিকতা। পাঠকের 'মর্জি' পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটে কবির সৃষ্টিতেই। তিনিও যেহেতু যুগের সৃষ্টি তাই তাঁর আগের কালটি থেকে তিনি তো অনিবার্যভাবেই এগিয়ে থাকবেন। মনোভাব পালটানো মানে বিষয় পালটানো, আর কবিতায় বিষয় যখন পালটে যায় তখন তার প্রকাশের মাধ্যমও পালটে যায়। কবিতার ক্ষেত্রে এ-কথা বেশি সত্য।

মনোভাব প্রকাশের জন্য কবিকে ভাষার সাহায্য নিতে হয় ঠিকই, কিন্তু ভাষার মধ্যে তাঁকে সৃষ্টি করতে হয় 'ভাষাতীতের ব্যঞ্জনা'। এই ব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য কবিকে কখনো শব্দ দিয়ে ছবি আঁকতে হয়। কখনো-বা শব্দকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হয় যাতে তার ভিতর থেকে অন্য অর্থের আভাস ফুটে ওঠে। আর যাকে উপমা বলা হয় সেই একই লক্ষণ-বিশিষ্ট দুই বস্তুর মধ্যে তুলনা তো আছেই।

এ-ছাড়া কাব্যের আলোচনায় 'রূপকল্প' বা 'চিত্রকল্প' শব্দ দুটিও ঘুরে-ফিরে আসে। 'কল্প' শব্দের একটা অর্থ 'সদৃশ' বা 'মতো'। তাই যেখানে কথা দিয়ে কবিতায় ছবি আঁকা হয় অথবা শব্দ দিয়ে রূপজগতের আভাস সৃষ্টি করা হয় সেখানেই 'চিত্রকল্প' বা 'রূপকল্পের' সূচনা। আপাতদৃষ্টিতে দুটি পৃথক হলেও প্রকৃত অর্থে দুটি একই। শুধু আধুনিক কালেই নয়, কাব্যসৃষ্টির সূচনাপর্ব থেকেই কবিতায় উপমা, রূপকল্প বা চিত্রকল্পের প্রয়োগ ঘটে আসছে। নইলে সাধারণ বাক্যের সঙ্গে কবিতার পার্থক্য থাকত না।

এ-সব তথ্য অনেকেরই জানা। তাই অকারণ ভূমিকা না-বাড়িয়ে মূল আলোচনায় আসা যাক। যেখানে আলোচ্য বিষয় 'আধুনিক বাংলা কবিতায় উপমা, রূপকল্প বা চিত্রকল্পের ব্যবহার' সেখানে আধুনিকতার সময় নির্ণয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'-র ভূমিকাতে সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের পরে রবীন্দ্রনাথই প্রথম আধুনিক।" অর্থাৎ বাংলা কবিতায় আধুনিকতার সূত্রপাতও তাঁরই হাতে। তাই 'লিপিকা'-র 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' দিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনা। বুদ্ধদেব ঠিকই করেছিলেন, তবে 'ক্ষণিকা'-র 'বোঝাপড়া'-র মতো কবিতা সংকলনে থাকলে হয়তো ভালো হত। কারণ, রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছিলেন যে 'ক্ষণিকা'-তেই তিনি বাংলা কবিতায় আধুনিকতা নিয়ে এলেন। তবে 'লিপিকা'-য় যেহেতু তিনি গদ্যকবিতার একটি ভবিষ্যৎ-প্যাটার্ন তৈরি করে দিয়ে গেলেন তাই তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। 'লিপিকা'-র প্রথম রচনায় ('সন্ধ্যা ও প্রভাত') অসামান্য উপমা-প্রয়োগ প্রথমেই নজরে আসে— "অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা/বাসরঘরের দ্বারের পাশে অবগুণ্ঠিতা নববধূর

মতো।" চিত্রকল্প বা রূপকল্প যা-ই বলি-না কেন, 'বলাকা'-র একটি কবিতায় এই অসামান্য পঙ্‌ক্তিগুলি এখনও অবিস্মরণীয়— "চাহি সেই দিগন্তের পানে/শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।" অথবা, 'শেষ লেখা'-র 'ধূসর গোধূলিলগ্নে' কবিতার সেই চমক-লাগানো পঙ্‌ক্তিগুলি—

ধূসর গোধূলিলগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্ত সূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা—

এখানে জীবন ও মৃত্যুর একাত্মতা বোঝানোর জন্য আশি বছরে পা-দেওয়া কবি যে-রূপকল্পের সাহায্য নিয়েছেন তা সমসাময়িক তরুণদের অনেকেরই আয়ত্তাধীন ছিল না।

বুদ্ধদেব বসুর দোহাই দিয়ে আধুনিকতার চর্চায় রবীন্দ্রনাথকে টেনে আনলেও এবারে 'স্বীকৃত' আধুনিকদের কথাই ভাবতে হবে। এবং অবশ্যই এর পুরোভাগে থাকবেন জীবনানন্দ দাশ। কিন্তু তার আগে বাংলা কবিতায় যথার্থ আধুনিকতার সূচনার পটভূমিকাটি বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। বিশ শতকের প্রথমার্ধ আধুনিক বাংলা কবিতার জন্মকাল বলে ধরে নেওয়া হয়। ওই সময়ের কবিদের উপর দেশজ প্রভাব তেমন কাজ করেনি, বিদেশী কবিরা ছিলেন অনেকেরই আদর্শ। দীর্ঘ আলোচনা এ-ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। এটুকু মনে রাখাই যথেষ্ট যে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় কবিরা, বিশেষ করে এলিয়ট, ইয়েট্‌স বা ফরাসি কবি মালার্মে আধুনিক কবিদের অনেককেই প্রভাবিত করেছিলেন। এলিয়ট আধুনিক জীবনের নিঃসঙ্গতা ও যন্ত্রণাকে বিভিন্ন উপমা ও রূপকল্পে প্রয়োগ করেছিলেন। নিঃসঙ্গ আধুনিক মানুষের যন্ত্রণা প্রকাশের ভাষাকে তিনি শুকনো ঘাসের ওপর বয়ে-যাওয়া বাতাসের শব্দের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন (As wind in dry grass), আর মালার্মে তো সরাসরি কবিতাকে শব্দপ্রধান বলে তার ভাবপ্রাধান্য উপেক্ষা করেছিলেন। তাঁর মতে, শব্দ দিয়েই চিত্রকল্প বা রূপকল্প রচিত হবে, ভাবের সেখানে কোনো ভূমিকা নেই (Poetry is written with words, not with ideas)। আধুনিক কবিদের অনেকেই এঁদের প্রভাব উপেক্ষা করতে পারেননি।

এবারে ধারাবাহিক ভাবে কিছু কিছু নিদর্শনের পালা। তবে এটাও আগে বলে নিতে হয় যে উপমা, রূপকল্প বা চিত্রকল্প ছাড়া যে কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয় না এ-সত্যটি আধুনিক কবিদের অবশ্যই জানা ছিল। এটা ভারতীয় আলংকারিকদের স্পষ্ট নির্দেশও বটে। তাঁরা অলংকারকে 'কাব্যদেহের সাজসজ্জা' বলেছিলেন। 'রীতি'-কে বলেছিলেন 'কাব্যের অবয়ব-সংস্থান'। অর্থাৎ যেখানে যে যে উপমা, রূপকল্প বা চিত্রকল্প সুপ্রযুক্ত সেখানে তার যথাযথ প্রয়োগই 'রীতি' বা স্টাইল। এই স্টাইল বা রীতির বিশিষ্ট প্রয়োগের ভিত্তিতেই এক-একজন কবির পৃথক সত্তা গড়ে ওঠে। 'উপমা কালিদাসস্য' কথাটির তাৎপর্য এই যে, উপমা প্রভৃতি অলংকারের প্রয়োগের মধ্য দিয়েই কালিদাস সমসাময়িকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠেন।

কাব্য আধুনিকতায় পা দেয় যখন নতুন বিষয়ের পাশাপাশি নতুন 'কাব্যভাষারও' সৃষ্টি হয়। এই 'কাব্যভাষা' শব্দটির ওপর জোর দিতে হবে। সমকালীন বিষয় কবিতায় আধুনিকতা আনে না, যতক্ষণ-না তাকে নতুন কাব্যভাষায় নতুন ধরনের উপমা বা চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে
ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল—

জীবনানন্দের অতিখ্যাত 'বনলতা সেন' কবিতার এই উদ্ধৃতি আপাদমস্তক আধুনিক। 'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে'-র মতো অসাধারণ আধুনিক উপমা বাঙালি পাঠকের আগে কোনোদিন চোখে পড়েনি, এর আগে রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতায় 'সন্ধ্যার' উপমা আচ্ছন্ন ছিল— "নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচল খসা হাতে দীপশিখা।" জীবনানন্দ উপমার খোলনলচে পালটে দিলেন। এর চেয়েও উপমা যেন আরও একধাপ এগিয়ে যায় যখন পাঠকের চোখে পড়ে— "পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।" পাখির নীড় যেমন শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক, বনলতা সেনের চোখ দুটিও যেন তা-ই। আধুনিক কবিতার অনুরাগী পাঠকমাত্রেরই জানা যে উপমা, রূপকল্প বা চিত্রকল্প যা-ই হোক-না কেন, এ-সবের ব্যবহারে জীবনানন্দের স্থান পুরোভাগে। এখনও পর্যন্ত এই জাতীয় উপমা বা চিত্রকল্পের বিকল্পের জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি—

ক) *খেলার বলের মতো তাদের হৃদয় এই জানিয়াছে।*
খ) *আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।*
গ) *মাইল মাইল সুপুরিবন আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে।*
ঘ) *যারা অন্ধ, সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা।*

সবাই জীবনানন্দ নন, হবার কথাও নয়। কিন্তু কাব্যভাষা পালটানোর সঙ্গে সঙ্গে কবিতার ফর্মেরও যে-ভাঙাচোরা চলছিল তা ক্রমশই স্পষ্টতর হতে থাকে। নতুন নতুন চিত্রকল্প ব্যবহারের ঝোঁকও দেখা যায়। 'ধ্রুপদী' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এ-জাতীয় রোম্যান্টিক চিত্রকল্পের অনায়াস-ব্যবহার করেন—

একটি কথার দ্বিধা থরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী,
একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণি জুড়ে
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি।

কিংবা রোম্যান্টিক বুদ্ধদেবের ইলিশ প্রসঙ্গে "জলের উজ্জ্বল শস্য" অথবা "আমি জানি কিছুই থাকে না/সকলি শুকায়ে যায়, সবই যেন সাবানের ফেনা"— এতদিনের পরিচিত কাব্যভাষা থেকে আলাদা।

নাগরিক জীবনের কিংবা সমকালীন সমাজ-সভ্যতার বিষণ্ণ ধূসরতা প্রকাশের ক্ষেত্রে আলাদা চিত্রকল্প ব্যবহৃত হচ্ছিল। এ-ব্যাপারে পরিণত বয়সের জীবনানন্দ, সমর সেন বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরা আলাদা ঘরানার। ইতিমধ্যে সময়ও দ্রুত পালটাচ্ছিল। ত্রিশের দশকের অর্থনৈতিক মন্দা, রাজনৈতিক আন্দোলন, শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির অধিকার আদায়ের সংগ্রাম— কোনো কিছুই কবিদের দৃষ্টি এড়ায়নি, অনেক ক্ষেত্রে কবিরা নিজেই এই সমস্ত আন্দোলনে বিশ্বাসী অথবা এর অংশীদার। এই পর্বেই কবিতার ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। একদিকে হতাশা ও অবক্ষয়ী চেতনা, অপরদিকে বিশ্বাসে দৃঢ় প্রত্যয় কবিতার ভাষাকেই কেবল পালটায়নি, রূপকল্প বা চিত্রকল্পও আমূল পালটে দিয়েছে। পরিবর্তিত মনোভাব প্রকাশের জন্যই এই আমূল পরিবর্তন।

'বনলতা সেন'-এর জীবনানন্দই প্রথম আধুনিক নাগরিক সভ্যতার 'অদ্ভুত আঁধার'টি লক্ষ করেছিলেন। 'নগরীর রাত্রি' যে তার এতকালের পরিচিত রোম্যান্টিকতা হারিয়েছে সেটা দেখতেও তিনি ভোলেননি— নগরীর মহৎ রাত্রিকে তাঁর মনে হয় "লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।/তবুও মানুষগুলো অনুপূর্ব— অতিবৈতনিক/বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।" গ্রাম, নগর সর্বত্র যে 'অদ্ভুত আঁধার' জীবনানন্দের দৃষ্টিগোচর, নাগরিক সভ্যতার নৈরাজ্য যাকে জঙ্গলের চিত্রকল্পের সাদৃশ্য এনে দিয়েছে সেই শহরেরই বিশেষণ প্রসঙ্গে 'ধূসর' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন সমর সেন—

কালীঘাট ব্রিজের ওপর লম্পটের পদধ্বনি
শুনতে কি পাও
হে শহর, হে ধূসর শহর।

এই 'ধূসর শহর' রূপকল্পটি টি. এস. এলিয়টের 'unreal city'-র প্রতিফলন বলেই মনে হবে। বস্তুত নাগরিক চিত্রকল্প বা রূপকল্প প্রয়োগে সমর সেনকে আলাদা গুরুত্ব দিতেই হবে। সমসাময়িকদের মধ্যে তিনি এ-ব্যাপারে প্রায় অদ্বিতীয়—

ক. *মহানগরীতে এল বিবর্ণ দিন*
তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি।

খ. *তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে*
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন মেয়েরা আসে।

তবে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক চেতনা যে কাব্যভাবনাকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে, সমর সেন সহ অনেকের লেখাতেই তার নিদর্শন পাওয়া যাবে—

ক. *বিধ্বস্ত মাটিতে আনে ট্রাক্টরের দিন,*
জোসেফ স্তালিন। (সমর সেন)

খ. *হাওড়া-ব্রিজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সূর্য*
প্রকাণ্ড গুলিখাওয়া মানুষের মত।
(মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

গ. *ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটেতে জমেছে নির্জনতার কালো,*
হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।
(সুকান্ত ভট্টাচার্য)

ইচ্ছে করেই যাঁর নাম এখনও আড়ালে রাখা হয়েছে তিনি একাধারে নাগরিক ও রাজনৈতিক কবি। তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সমকালীন কবিতার ভাষা, রূপকল্প সব কিছুই একের পর এক তিনি পালটে দিয়েছেন।

ক. *এখানে আকাশ পাহাড়ের গায়*
পড়েছে ভেঙে
পাহাড়ের গায়ে সারি সারি সব
চিমনি চুড়ো।
ধানের জমিরা পাশাপাশি শুয়ে
দিগ্বিদিকে—
খাড়া করে কান কাস্তের শান
শুনছে নাকি

কামারশালে?

খ. *দিগন্তে কারা আমাদের সাড়া পেয়ে*
সাতটি রঙের
ঘোড়ায় চাপায় জিন।
তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে
আনতে চলেছি
লাল টুকটুকে দিন।

সুভাষের কবিতা থেকে এমন অজস্র উদাহরণ তোলা যায়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরও একটি আলোচনা আধুনিক কবিতা পাঠকের কাছে বেশ কৌতূহলজনক মনে হবে। সেটা হচ্ছে 'চাঁদ'-এর উপমা বা চিত্রকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবিদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন। "চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে উছলে পড়ে আলো'— এইসব রাবীন্দ্রিক চিত্রকল্পের দিন বাংলা কাব্য থেকে অনেক আগেই বিদায় নিয়েছিল। তার বদলে ক্রমশ পাওয়া গেল চাঁদের এইরকম উপমা—

ক. *বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে*
(জীবনানন্দ)

খ. *তন্বী চাঁদ ক্রোড়পতি ছাদের সোফায়*
(সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

গ. *এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে* (দিনেশ দাশ)

ঘ. *পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি*
(সুকান্ত ভট্টাচার্য)

তার মানে আবার এটাও নয় যে সমকালে বাংলায় কবিতার উপমা, রূপকল্প বা চিত্রকল্প থেকে রোম্যান্টিকতা একেবারে বিদায় নিয়েছে। এমন-কি বামপন্থী বলে অতিপরিচিত অনেক কবির কবিতাতেই 'রোম্যান্টিক ইমেজারি'-র ব্যবহার চোখে পড়বে। তবে কোনো কবিকে বামপন্থী বা অবামপন্থী বলে চিহ্নিত করা হাস্যকর। তাঁর মূল্যায়ন হবে সৃষ্টিক্ষমতা দিয়ে। আবার রোম্যান্টিকতা বাদ দিয়ে প্রত্যেক কবিরই সৃষ্টি অসম্পূর্ণ। তাই রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরিরাও 'রোম্যান্টিক ইমেজারি'-কে উপেক্ষা করতে পারেননি। এ-ক্ষেত্রে তথাকথিত রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক কবিদের মধ্যে পার্থক্য নেই—

ক. *মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর ওই পোড়ো বাড়িটার*
ভাঙা দরোজাটা মেলাবেন। (অমিয় চক্রবর্তী)

খ. *একদা এমনি বাদল শেষের হাওয়া*
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে।
(সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

গ. *চাইলে তুমি বিনা শান্তিও,*
তোমাকে চাই তাতে ক্ষান্তি নেই,
কৃষ্ণচূড়া রাঙে সে-ও তো হাহাকার
আমারি হৃদয়ের কান্তিও। (বিষ্ণু দে)

ঘ. *হে রাজকন্যে*
এ জনারণ্যে
তোমার জন্যে নেইকো ঠাঁই। (সুকান্ত ভট্টাচার্য)

ঙ. *চমকে উঠি— আরে!*
আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে।
(অশোকবিজয় রাহা)

চ. *অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল।*
(নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

অথবা, অধুনা বিস্মৃত কবি অরুণকুমার সরকারের একটি অনবদ্য চিত্রকল্প রচনা—

সিন্দুক নেই, স্বর্ণ আনি নি
এনেছি ভিক্ষালব্ধ ধান্য,
ও দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের
পাব কি পরশ যৎসামান্য।

এবং ঘুরেফিরে আবার সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কারণ, বর্তমান লেখকের মতে জীবনানন্দের পরে নতুন কাব্যভাষা ও রূপকল্প প্রয়োগে তিনিই অগ্রগণ্য—

জলায় এবার ভালো ধান হবে,
লণ্ঠন হাতে অন্ধকারটা নাচাতে নাচাতে
এ বাড়ির ছোটবউ এইসব ভাবছিল।

পরবর্তী পর্বের কবিদের কাছে যাবার আগে সম্ভবত এমন একজন কবির পাতা ওলটানো বাঞ্ছনীয় যিনি বয়সে প্রবীণ হয়েও কাব্যভাষা বা উপমা প্রয়োগে অনেক আধুনিক। তিনি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। 'সন্ধ্যা'-র অতিপরিচিত উপমাগুলিকে অস্বীকার করে তিনিই প্রথম লিখেছিলেন— "রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙীন বারাঙ্গনা।"

আর রবীন্দ্র-ঘরানার প্রচলিত রোম্যান্টিক কবিধর্মকে উপহাস করে তিনিই প্রথম লিখেছিলেন—

তব জয় জয়, চারিদিকে কয়, আলোক পাইল লোক,
শুধাই তোমারে কি আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ।
চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি সাহারার বুকে?।

শেষের দুটি লাইন একদা কল্লোলীয়দের মুখে মুখে ফিরত।

দশকের পর দশক পরিবর্তিত হয়, কবিতার চেহারাও পালটাতে থাকে। আগেই বলেছি, সময় যে কেবল নতুন বিষয়ের জন্ম দেয় তা-ই নয়, তা প্রকাশের নতুন আঙ্গিকেরও সৃষ্টি করে। তাই চল্লিশের দশকের বিদায়ের পর কবিতা যখন পঞ্চাশের দশকে পা দেয়, তখন নতুন কালকে তুলে ধরবার জন্য কবিদের নতুন নতুন উপমা বা চিত্রকল্পেরও সৃষ্টি করতে হয়—

ক. *মায়ের চোখে বাপের চোখে দু'তিনটি গঙ্গা।*
(শঙ্খ ঘোষ)

খ. *মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।* (শঙ্খ ঘোষ)

গ. *বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস*
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে।
(শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

ঘ. *পায়ের নীচে শুকনো বালি, মাটি খুঁড়লে জল,*
গভীরে যাও, গভীরে যাও বুকের হলাহল।
(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

পঞ্চাশের দশক এবং কৃত্তিবাস-গোষ্ঠীর এই তিন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির রচনার এই সামান্য নিদর্শন প্রমাণ করে যে কবিতার দিন পালটে গেছে। এঁরা কেউ পুরনো ধাঁচের বাক্যবন্ধ বা চিত্রকল্প ব্যবহার করেননি, নিজেদের আলাদাভাবে তৈরি করে নিয়েছেন। যাঁরা রাজনৈতিক কবি হিসেবে পরিচিত তাঁরাও এ-ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। অর্থাৎ কবিতার কাঠামোটারই ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। উদাহরণের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ানো যেতে পারে—

ক. *ফুল ছুঁয়ে যায় চোখের পাতায় জল ছুঁয়ে যায় ঠোঁটে।*
ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসি রাত থাকতে ওঠে।
শুকতারাটি ছাদের ধারে চাঁদ থামে তালগাছে,
ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসি ছাড়াকাপড় কাচে।
(জয় গোস্বামী)

খ. *সব রক্ত আর জল মিলে মিশে প্রণামের মত*
রক্তিম ভোরের দিকে যাবে।
আজ নয়, কালও নয়, তবু জেনো একদিন হবে।
(অমিতাভ দাশগুপ্ত)

অথবা

গ. *হৃদয় যতটা বামে আমি তার চেয়ে বেশি বামপন্থী নই।* (অমিতাভ দাশগুপ্ত)

আবার একই সময়ের কবি তরুণ সান্যালের ব্যবহৃত একটি চমৎকার চিত্রকল্প একদা আমাদের চমৎকৃত করেছিল— "হাওয়ায় ধুলোর গন্ধ, ধুলোয় সূর্যের রক্ত, রক্তমাখা করুণ কান্নায়।"

ষাটের দশকের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিরা যে একাধারে কবিতার প্যাটার্ন ও চিত্রকল্প পালটে দিয়েছিলেন, এ-সময়ের অন্যতম শক্তিশালী কবির একটি স্তবকই তার অনবদ্য নিদর্শন—

দশটি আঙুলে আমি দশটি উদ্যান ধরে আছি,
কখন নখাগ্র হল গণ্ডারের খড়্গ
ধূর্ত সাপের বিষদাঁত
আমিই জানি না। (পবিত্র মুখোপাধ্যায়)

আবার একটি বিখ্যাত রাজনৈতিক কবিতায় কবিকে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে রবীন্দ্র-সংগীতের একটি পঙ্‌ক্তিকে চিত্রকল্প প্রয়োগের কাজে লাগাতে দেখা যায়—

উনুন জ্বলেনি আজ
ছিটের বেড়ার গায়ে ডানপিটের তেজি রক্তধারা
গোধূলি গগন মেঘে ঢেকেছিল তারা।
(মণিভূষণ ভট্টাচার্য)

অথবা, নবারুণ ভট্টাচার্যের সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি— "এই বধ্যভূমি আমার স্বদেশ নয়"— কাব্যরূপ ও উপমার সব ধারণাই পালটে দেয়। আবার পূর্ণেন্দু পত্রীর একটি পঙ্‌ক্তি হঠাৎই ভিতরটা নাড়িয়ে দেয়— "ভীষণ বৃষ্টির শব্দ সারাদিন স্মৃতির ভিতরে।"

এভাবেই কবিতা যত এগিয়ে চলে নতুন থেকে নতুনতর উপমা বা চিত্রকল্প তাতে সংযোজিত হতে থাকে। একদা পাঠককে চমকিত-করা তুলনাগুলি ক্রমশ যেন ম্লান হয়ে যায়। এরই মধ্যে রমানাথ ভট্টাচার্যের মতো প্রবীণ কবি হঠাৎই হয়তো এই ধরনের চমকিত করবার মতো একটি পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করেন— "প্রস্ফুটিত জবা যেন চেলি পরা পরী।" তবে ধীরে ধীরে নতুন কালের পদধ্বনি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়। আর নতুনতর রূপকল্পের জন্য পাঠকেরা অপেক্ষা করতে থাকে। ❑